দৈনিক সংবাদ

15 FEB 1987

তথ্য ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

7020

শিক্ষার সংকট : কিছু ভাবনা

আবদুল খালেক

প্রাক্তন আই. জি. পুলিশ

কিছুকাল আগে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব তিনজনের মধ্যে [illegible] ভাগি হয়; কিন্তু কোন চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন [illegible] যোগ দিতে পারেননি। [illegible] দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের কনভোকেশান ভণ্ডুল হয়ে যায় মোনেম খানের উপস্থিতির বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদের মুখে। তারপর থেকে আর কোন কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর শোনা যায়নি। ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বড় বড় গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে। শতাধিক রাজনৈতিক দলের লক্ষাধিক নেতা-উপনেতা রাজনৈতিক অঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন। বন্দরনায়েকে, কোরাজন ও ইন্দিরা গান্ধীর আবেগে বাংলাদেশও আপ্লুত হয়েছে, যার ফলে ইউরোপীয় ইতিহাসের দুই গোলাপের যুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধ বেধেছে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের ছন্দে ও মাদকতায় অর্থনীতি প্রণীত হয়েছে। রাষ্ট্রীয়কৃত সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৈদেশিক ঋণ ও বশ্যতামূলক আন্তর্জাতিক মিত্রতার চাপে-প্রচাপে দেশের অর্থনীতি দিকভ্রষ্ট হয়েছে। প্রশাসনে নৈরাজ্য এসেছে। রাজনৈতিক চরিত্রহীনতা, দুর্নীতি ও ডিগবাজির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। সাদা ও কালো টাকার পাহাড় গড়ে ওঠেছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে। দেশে ভূমিহীনদের বৃদ্ধির হার বেড়েছে। দেশবাসীর একটি বিরাট অংশ অনাহারে, অর্ধাহারে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অপুষ্টির শিকার হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের লালঘোড়া অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে। সরকারী ও বেসরকারী স্কুল-কলেজের দুরবস্থা বেড়েছে। প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকরা লাঠিপেটা খেয়েছেন। হাইস্কুল ও কলেজ শিক্ষকরা জেলজুলুমের শিকার হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হরতাল মিছিল করেও তাদের দাবী আদায়ে ব্যর্থ হয়েছেন। উচ্চশিক্ষিত বেকাররা চোখে সরষের ফুল দেখছেন। ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সংকুচিত হয়েছে। শিক্ষালয়ে সন্ত্রাস, দাংগা, বোমাবাজি বিকাশ লাভ করেছে। নারী নির্যাতনের আর্তনাদ ও নিরাপত্তার অভাব দেশে-বিদেশে সমবেদনার সৃষ্টি করেছে। শিল্পোন্নয়ন ভেস্তে গিয়েছে। এবং সর্বোপরি সোনালী আঁশ ধ্বংস হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেশবাসীর কাছে সফলতার বয়ান করে চলেছি জোরেশোরে। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ হয়েও পোজপাজে সব দেশের ওপর টেক্কা মারতে চেয়েছি। কিন্তু সার্কের উদ্যোক্তা হয়েও সেক্রেটারিয়েট ঢাকায় রাখতে সক্ষম হইনি।

এতসব ব্যর্থতার মূল কারণ হলো : আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সার্বজনীন মানবতার আদর্শে সম্পৃক্ত নয়। আমরা চলেছি ভিন্ন রুটে। আমাদের নেই সৎ, চরিত্রবান নেতৃত্ব। শতধাবিভক্ত ক্ষোভ-বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারী সামনে। রাষ্ট্রপতি সংসদ ভাষণে বাংলা ভাষার প্রচলন সম্বন্ধে যা বলেছেন তার সংশোধনী তিনি [illegible]

ছেন। আগামীতে, ২১শে ফেব্রুয়ারীর পরবর্তী দিনগুলোয় এই ছোট ই-রেজী অক্ষরগুলোর কলেবর বাড়বে না।

যাক, সেকথা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা পরিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডের তোয়াক্কা না করে ঢাকা ও অন্যান্য শহরে হাজারখানেক কিণ্ডার গার্টেনে প্রধানতঃ উচ্চ শিক্ষিত মহিলারা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাদান করছেন। মা-বোনের মতো স্নেহশীল শিক্ষকদের আদরযত্নে গড়ে ওঠছে ভাগ্যবান কচিকাঁচাদের ছাত্রজীবন। দুই তিন হাজার টাকা মাসিক ছাত্র বেতনের স্কুল ঢাকা শহরেই রয়েছে। ভর্তির ভিড় দেখে গাইড-বুকও প্রকাশিত হয়েছে। ক্যাডেট কলেজের জন্যে গড়ে ওঠেছে টিউটোরিয়্যাল হোম। সেখানে ক্যাডেট কলেজ, ''এ-লেভেল'' ''ও লেভেল'' ইত্যাদির জন্যে তৈরী করার ব্যবস্থা রয়েছে। পৌর প্রাইমারীতে পড়ে নিম্ন-বিত্তের ও গরীব ঘরের কচিকাঁচারা। গ্রামীণ সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারীতে পড়ে পাট-চাষী ধান চাষী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বিত্ত মানুষের ছেলেপিলেরা। আর্থিক পরিস্থিতির জন্যে গরীব ঘরের ছেলেপিলেরা অন্যদের সংগে পেরে ওঠে না। এই যে পেরে-না-ওঠার দুর্ভাগ্য তা তাদের বাকী জীবনেও লেগেই থাকে। এই বৈষম্য শ্রেণীবৈষম্যকে প্রখরতর করে তুলেছে বাংলাদেশে। দৈনিক সংবাদ-এ জেলা-উপজেলা প্রাইমারী স্কুলের প্রতিবেদন পড়লে বিপ্লবের মনোভঙ্গি সৃষ্টি হয় কারো কারো মধ্যে। কিন্তু তারা ও তাদের সে মনোভঙ্গি হারিয়ে যায় বনিক-বণিক হবার লোভে। রাজনৈতিক কর্তারা ও তাদের অর্থনৈতিক সহচররা দেশের প্রাইমারী স্কুলের ধার ধারেন না বহুকাল আগে থেকেই।

এমনি তো দশ কোটির মধ্যে সাত-আট কোটি পরিবারের শিশুদের শতকরা পঁচিশ জন অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের কারণে পাঁচ বছর হবার আগেই মরে যায়। যারা বাকী থাকে তাদের প্রায় অর্ধেক একই কারণে স্কুলে যেতে পারে না। আর যারা স্কুলে গেল প্রাইমারী স্তরের শেষ সীমায় তাদের অনেকে না পৌছেই জীবিকার অন্বেষায় বেরিয়ে পড়ে শিশু শ্রমিক হিসেবে পেটে-ভাতে অথবা মাসিক বিশ ত্রিশ টাকার মাইনেতে। তাদেরকে স্কুলে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই গণমুখী শিক্ষার ব্যবস্থাপনায়। প্রশাসন দেশবাসীর দ্বারে এলো, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রাইমারীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। ব্যক্তি মালিকানার স্বাদে-গন্ধে সবাই মুখরিত হলাম, সানাই বাজিয়ে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণের মাদকতায় মত্ত হলাম, কিন্তু কৈ দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলার চাল[illegible] এখনো ছাড়তে পা[illegible] আগের দিনে জমিদা[illegible] জন্য অবদান রাখ[illegible] বড় বড় স্কুল-কলেজ[illegible]

ও বড় বড় নির্বাচনের খরচ।

শিক্ষা মানুষকে উন্নত জীবনের সন্ধান দিয়েছে। আজকের পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ধারক-বাহক, সে জাতি তত বেশী সমৃদ্ধিশালী। তাই শিক্ষা খাতের চেয়ে অধিকতর উৎপাদনশীল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী খাত আর কিছু হতে পারেনা। বাংলাদেশ পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করেছে। শতকরা সত্তরের বেশী নম্বর ইন্টারমিডিয়েটে পেয়েও ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারি কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য অনুষদগুলোতেও পরিস্থিতি প্রায় একই রকম। শিক্ষা-সঙ্কোচন করে বেকারত্ব এড়াবার প্রচেষ্টা বাংলাদেশেই সম্ভব। কেননা, আমরা দেশের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উন্নতি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আপামর জনসাধারণের জন্য রেখেছি ধোকাবাজি। শ্রীলঙ্কার মতো একটি দেশে রয়েছে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। তার ছয় গুণেরও বেশী জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশে কয়টি? বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিং, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমাদের উচ্চ শিক্ষার চাহিদা মেটানো সম্ভব। তবে কথা হলো : এর প্রয়োজনটা কোথায় তা বের করার মতো কিছু আমাদের মাথায় এখনো ঢুকেনি। প্রশাসনেও গুণীজ্ঞানীদের স্থান দিন দিন কমে আসছে।

সরকারী প্রাইমারীতে চল্লিশ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য। শূন্যপদ সরকারী কলেজে হাজার তিনেকের কম হবে না। অর্থনীতির বিভিন্ন অংগনে ও প্রশাসনে হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষিতের পদ শূন্য রাখা হয়েছে নিয়োগ বন্ধ করে। ফলে, সবকিছুই যেন নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। শিক্ষার মান বাড়াতে হলে শিক্ষকের যোগ্যতার মানদণ্ডও উন্নীত করতে হবে। এখন থেকে প্রাইমারী স্কুলে আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট নিয়োগ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। হাইস্কুলেও সম্মান ও মাষ্টারস ডিগ্রীপ্রাপ্তরা নিযুক্ত হতে পারেন। বেতনের হার হওয়া উচিত শিক্ষকের যোগ্যতা অনুযায়ী। সে জন্যে বলছি, অবিলম্বে বারো হাজার বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলকে সরকারী করে নেয়া হোক। এখন থেকে প্রাইমারীর শূন্যপদে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ করে প্রাইমারী শিক্ষকদেরকে নিজ গ্রামের এবং যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিকটতম গ্রামের স্কুলে স্থায়ীভাবে রাখা হোক। তাতে তারা তাদের ক্ষুদ্র সংসারের দিকে তাকাবার সুযোগ পাবে। শিক্ষক সমিতির সঙ্গে বসে দাবী দাওয়াগুলোর আশু মীমাংসা করতে হবে। [illegible] বলতে চাই যে, প্রাই-[illegible] আসবাবপত্র, শিক্ষা [illegible] সুবিধা- [illegible] যোগান দেয়ার [illegible]

... প্রাইমারীর জন্য কিছু করা যাবেনা [illegible] না। আমার মনে হয় আগামী পহেলা বৈশাখ থেকে একমাস ''প্রাইমারী স্কুল উন্নয়ন মাস'' হিসেবে পালন করা হোক। ঐ সময়ে প্রতিটি ইউনিয়নের সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোর শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ, পায়খানা-প্রস্রাবখানা, টিউবওয়েল ইত্যাদি সমস্যা স্থানীয় প্রচেষ্টায় সমাধান করতে হবে। উপজেলা কর্তৃপক্ষকে এই মাসটি সফল করার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

প্রাইমারী শিক্ষার সর্বনাশ সাধিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের নীতি এবং শিক্ষার পাঠক্রমে অতিরিক্ত বোঝার মাধ্যমে। প্রতি বছর পাঠ্যপুস্তক বদলাবার প্রয়োজন থাকতে পারে না। চারদিকে স্বার্থবাদীদের খপ্পরে পড়ে ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক সময়মত পায়নি। হাইস্কুলেও একই অবস্থা। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অযোগ্যতা তার জন্য দায়ী। বোর্ডের অনুমোদিত পাঠক্রম দেখলে মনে হয় আমরা প্রাইমারী ছাত্রদেরকে দুনিয়ার সবকিছু ঐ বয়েসেই শেখাতে যাচ্ছি। ফলে, তারা কিছুই ভাল করে শিখছে না।

প্রাইমারীর দুর্বলতা নিয়ে ছাত্ররা যখন হাইস্কুলে যায় তখন হাইস্কুলে বিরাজমান শিক্ষার দুর্বলতা তাদেরকে আরো জোরেশোরে আঁকড়ে ধরে। এইভাবে সারাটা ছাত্রজীবনে নেমে আসে পুঞ্জীভূত দুর্বলতার চাপ। ছাত্ররা তখন নকলবাজির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং কিছুসংখ্যক শিক্ষক ও অভিভাবক তার সহায়তা করেন। পরীক্ষার সময় শিক্ষক বহিষ্কারের দৃষ্টান্তই তার সাক্ষ্য। ক্লাসে ঠিকমতো পড়াশুনা হলে নকলবাজি কমে আসবে বৈকি। এবং প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজনীয়তাও কমে আসবে। শিক্ষার ভিত্তিমূল বলে প্রাইমারী শিক্ষাতেই জাতির দৃষ্টি সর্বাগ্রে নিবদ্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো এদিকে একটু উচ্চবাচ্য করলে দেশের অনেক উপকার সাধিত হবে।

আরেকটি কথা বলেই শেষ করছি। প্রাইমারী স্কুলের পর হাইস্কুলে যাবার সুযোগ মেয়েদের প্রায়ই হয়ে উঠেনা। গ্রাম-গঞ্জের যাতায়াত ব্যবস্থা ও আরো কতেক কারণে এটা ঘটছে। সে জন্যে প্রাইমারী স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা করলে মেয়েরা নিকটতম দূরত্বে থেকে একটি উচ্চতর ক্লাসে শিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। প্রাইমারীতে গ্রাজুয়েট শিক্ষকের কথা আগেই বলেছি। কাজেই ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারীতে পড়াবার অসুবিধা হতে পারে না। কালক্রমে প্রাইমারীতেই শুধু মেয়েদের জন্য সপ্তম অষ্টম ইত্যাদি ক্লাশ খোলা যেতে পারে। তাতে মেয়েদের পড়ার সুযোগ বাড়বে। হাইস্কুলে যাওয়া গ্রামে-গঞ্জে মেয়েদের জন্য খুব সহজ ব্যাপার নয় বলেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতায় মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দিলে গ্রামীণ কচিকাঁচারা স্কুলে মায়ের স্নেহযত্নে গড়ে ওঠবে, যেমন ওঠছে কিণ্ডার গার্টেনের ছেলেমেয়েরা। [illegible]